

শরহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেতীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আকীদার বিষয়গুলোর পরিপূরক হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ করে থাকে, সে ব্যাপারে একটি অনুচ্ছেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ সালেহ ফাওয়ান [অনুবাদ: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী]

আকীদার বিষয়গুলোর পরিপূরক হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ করে থাকে

فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة

আকীদার বিষয়গুলোর পরিপূরক হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ করে থাকে, সে ব্যাপারে একটি অনুচ্ছেদ:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেন,

ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تَوْجِبُهُ الشَّرِيعَةُ وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمُعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَارًا وَيَحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحَمَى وَالسَّهَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرِّخَاءِ وَالرِّضَا بِمَرِّ الْقَضَاءِ

পূর্বে যেসব মূলনীতির কথা আলোচনা করা হলো, তা বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দেয়, শরীয়তের অপরিহার্য দাবী মোতাবেক অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে এবং শাসক গোষ্ঠির সাথেই হজ্জ পালন করে, জিহাদ করে, জুমআ ও ঈদের সালাত আদায় করে। এটিকে তারা আবশ্যিক মনে করে। শাসক গোষ্ঠি ন্যায়পরায়ন হোক কিংবা যালেম ও পাপাচারী হোক, -উভয় অবস্থাতেই তারা উপরোক্ত কাজগুলো তাদের সাথেই সম্পাদন করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা জামাআতের সাথে নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকে, উম্মতের সকল শ্রেণীর মানুষকে নসীহত করাকে এবাদত ও দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। তারা এই হাদীছ দু'টির মর্মার্থ বাস্তবায়ন করাকে আকীদাহ'র অংশ মনে করে, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ»

“এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীর সদৃশ। তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন” [2] তিনি আরো বলেনঃ

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ

وَالْحُمَّى» (بخارى: 6011)

“পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়”।

সেই সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা বালা-মসীবত ও বিপদাপদের সময় সবার করা, সুখ-শান্তির সময় আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাকদীরের তিক্ত বিষয়গুলো সম্ভ্রষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার উপদেশ প্রদান করে।

ব্যাখ্যাঃ এই অধ্যায়টি পূর্বের অধ্যায়ের পরিপূরক স্বরূপ। এতে শাইখুল ইসলাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐসব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যা তাদের আকীদাহ’র বিষয়গুলোকে পূর্ণতা দান করে। শাইখুল ইসলাম বলেনঃ অতঃপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা এই মূলনীতিগুলোর সাথে অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেসব মূলনীতি অতিক্রান্ত হলো, তারা সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার সাথে সাথে এমন কিছু বৈশিষ্ট ও গুণাবলী অর্জন করে, যা তাদের আকীদাহ’র মৌলিক বিষয় না হলেও আকীদাহ’র বিষয়গুলোকে পূর্ণতা দান করে। সেগুলো তাদের গৃহীত আকীদাহ’র ফলাফলও বটে। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তাআলা তাদের এই বৈশিষ্ট কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“তোমরাই দুনিয়ার সর্বোত্তম দল। তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা উত্তম কাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। আহলে কিতাবরাও যদি ঈমান আনয়ন করত, তাহলে তাদের জন্যই ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই হলো ফাসেক”। ঈমান ও সৎ আমল সম্পর্কিত যেসব কথা ও কাজ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন, তাই উত্তম কাজ বলে বিবেচিত। আর আল্লাহ তাআলা যা অপছন্দ করেন এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তাই অপছন্দীয় কাজ বলে বিবেচিত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা শরীয়তের দাবী মোতাবেক অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতা থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ হতে বারণ করতে গেলে কল্যাণ অর্জিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি সামনে রেখে প্রথমে শক্তি প্রয়োগ করে, শক্তি না থাকলে জবানের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, তাও না থাকলে অন্তর দিয়ে অন্যায়ের অপসারণ কামনা করে ও আল্লাহর নিকট অন্যায়ের লিগুদের হেদায়াতের জন্য দুআ করে।

মুতাযেলারা এ বিষয়ে শরীয়তের দাবী ও বাধ্যবাধকতা মানেনা। তারা মনে করে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ বলতে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেই বুঝায়। শাসক গোষ্ঠি ন্যায়পরায়ন কিংবা ফাসেক যাই হোক না কেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা তাদের সাথেই হজ্জ পালন, জিহাদ, জুমআ ও ঈদাইনের সালাত সম্পন্ন করে। মুসলিমদের শাসকদের অধীনে থেকে দ্বীনের এই নিদর্শন বা অনুষ্ঠানগুলো পালন

করাকে তারা আকীদাহ'র অংশ মনে করে। শাসকরা যদি সৎ ও ন্যায়পরায়ন হয় এবং দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে অথবা তারা যদি এমন পাপাচারী হয়, যা তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়না, তাহলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা শাসকদের অনুগত থাকে এবং তাদের সাথেই উপরোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করে।

ফাসেক ও পাপাচারী শাসকদের সাথে ঐ কাজগুলো করার পিছনে মুসলিমদের উদ্দেশ্য হলো ঐক্য ঠিক রাখা এবং দলাদলি ও ফির্কাবন্দী থেকে দূরে থাকা। আর ফাসেক শাসক নিজের পাপাচারের কারণে শাসন ক্ষমতা থেকে নেমে যাবেনা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবেনা। কেননা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গেলে মানুষের হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রচুর রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ অতীতে যেসব ফির্কা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের বিদ্রোহের কারণে যে পরিমাণ লাভ হয়েছে, তার চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে অনেক বেশী। শাইখুল ইসলামের কথা এখানেই শেষ।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা এ বিষয়ে ঐসব খারেজী, মুতামিল, শিয়া এবং বিদআতীদের থেকে আলাদা, যারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই ও বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করে। বিশেষ করে যখন তারা শাসকদেরকে এমন কিছু করতে দেখে, যা যুলুম কিংবা যুলুম বলে ধারণা করা হয়। তারা এই বিদ্রোহকে সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা জামাআতের সাথে নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকেঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। চাই তা জুমআর নামাযের জামাআত হোক বা ওয়াকতীয়া নামাযের জামাআত হোক। কেননা জুমআ ও জামাআত ইসলামের বৃহৎ নিদর্শনসমূহের অন্যতম এবং তাতে রয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য। তারা ঐসব শিয়ার মত করেনা, যারা নিষ্পাপ ইমাম ছাড়া অন্য কারো সাথে নামায পড়াকে বৈধ মনে করেনা। তারা মুনাফেকদের থেকেও ভিন্ন, যারা জামাআতের সাথে নামায আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকে। জামাআতের সাথে নামায আদায়ের অনেক ফযীলত রয়েছে, জামাআতে শরীক হওয়ার আদেশ এসেছে এবং তা থেকে পিছিয়ে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি যেহেতু জামাআতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার স্থান নয়, তাই বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হলো।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা উম্মতে মুহাম্মাদীর লোকদেরকে নসীহত করাকে এবাদত ও দ্বীনের অংশ মনে করে। النصح শব্দের মূল অর্থ আন্তরিকতা, খাঁটিত্ব বিশুদ্ধতা ইত্যাদি। আর শরীয়তের পরিভাষায়: هي إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه অর্থাৎ উপদেশ দানকৃত ব্যক্তির শুভ কামনা করা এবং তার উপকার সাধনকারী বিষয়দির দিকে পথ নির্দেশ দেয়াকে নসীহত বলা হয়। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা উম্মতের জন্য শুভ কামনা করে এবং যাতে তাদের কল্যাণ রয়েছে, উহার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে।[3]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কল্যাণের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করে এবং তাদের কেউ আহত হলে কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হলে তার ব্যথায় ব্যথিত হয়। সুতরাং তারা এই হাদীছের মর্মার্থে বিশ্বাস করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ

كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য এমন প্রাচীর সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।[4] তিনি আরো বলেনঃ

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى» (بخارى: 6011)

“পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি মুমিনদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়”।

উপরের হাদীছ দু’টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মুসলিমদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কেমন হওয়া উচিত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা এই হাদীছ দু’টির দাবী অনুযায়ী আমল করে।

এক মুমিনের সাথে অন্য মুমিনের সম্পর্ক এবং মুমিনদের দৃষ্টান্তঃ এখানে ঈমান বলতে পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একজন পূর্ণ মুমিনের সাথে অন্য একজন পূর্ণ মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো, যেমন একটি মজবুত প্রাচীর, যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মজবুতভাবে যুক্ত ও লাগানো। মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা সহজভাবে বুঝানোর উদ্দেশ্যে এই দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মজবুতভাবে যুক্তঃ এই বাক্যে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহকে জালের মত বানালেনঃ এটি হলো মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের আরেকটি দৃষ্টান্ত। এ কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে এই উদাহরণটি পেশ করা হয়েছে। তারা সকলেই একটি মাত্র দেহের মত হবে। অর্থাৎ একটি শরীরের সমস্ত অঙ্গ যেমন পরস্পর জড়িত এবং আরাম ও কষ্ট অনুভব করার মধ্যে যেমন শরীরের সবগুলো অঙ্গই শরীক হয়, ঠিক তেমনি সমস্ত মুমিন মিলে একটি দেহের মতই। তাদের একজনের সুখ-শান্তি সকলেরই সুখ-শান্তি এবং একজনের দুঃখ-বেদনা সকলেরই দুঃখ-বেদনা।

তারা পরস্পরকে ভালবাসার ক্ষেত্রে এবং পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শনে একই দেহের মত। দেহের কোন অঙ্গ যখন অসুস্থ হয় এবং ব্যথা অনুভব করে তখন এক অঙ্গের ব্যথায় অন্য অঙ্গ শরীক হয়। অর্থাৎ শরীরের সকল অঙ্গই ব্যথিত হয়। সেই ব্যথার কারণে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং অনিদ্রায় রাত কাটাতে হয়। এমনি কোন মুসলিম যদি ব্যথিত হয়, তখন বিশ্বের সমস্ত মুসলিম সেই ব্যথায় শরীক হবে, এটিই ঈমানের দাবী।

এই হাদীছে মুসলিমদের পারস্পরিক বন্ধনের স্বরূপ তুলে ধরা হলেও তাতে মূলত আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ শরীরের এক অংশ ব্যথিত হলে সমস্ত শরীরেই যেমন সেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে, মুমিনদের অবস্থাও ঠিক একই দেহের মত হওয়া উচিত। তাদের কেউ কোন মসীবতে আক্রান্ত হলে সকলেরই তার সাথে ব্যথিত হওয়া উচিত এবং তার সেই মসীবত অপসারণের জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করা উচিত। এখানে বিষয়টিকে সহজভাবে পেশ করার জন্য উপমা প্রদান করা হয়েছে এবং মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের তাৎপর্যকে দৃশ্যমান চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিপদাপদ ও মসীবতের সময় দৃঢ়পদ থাকে এবং

মসীবতের সময় পরস্পরকে সবার করার উপদেশ দেয়।

الصبر শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আটকিয়ে রাখা, বাধা দেয়া। এখানে সবার অর্থ হলো মসীবতের সময় নফসকে অস্থিরতা প্রকাশ করা হতে বিরত রাখা, অভিযোগ ও বিরক্তি প্রকাশ করা হতে জবানকে আটকিয়ে রাখা এবং গালে চপেটাঘাত করা ও বুকের দিক থেকে শরীরের জামা ছিড়ে ফেলা থেকে হাতকে ব্যাহত করা।

البلاء অর্থ হলো মসীবত ও কঠিন অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো নেয়ামত ও সুখ-শান্তিতে থাকার সময় তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

الشكر বলা হয় এমন কাজকে, যা নেয়ামত প্রদান করার কারণে নেয়ামত প্রদানকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে যেই নেয়ামত দান করেছেন, তা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে ব্যয় করার নামই الشكر (কৃতজ্ঞতা)। প্রচুর ও ব্যাপক নেয়ামতকে বলা হয় الرخاء (স্বাচ্ছন্দ্য)।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তাকদীরের তিক্ত ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। الرضا (সন্তুষ্ট থাকা) السخط (অসন্তুষ্ট ও বিরক্তি প্রকাশ) করার বিপরীত। الفخاء শব্দের আভিধানিক অর্থ হুকুম করা, ফয়সালা করা। সকল সৃষ্টি এবং উহার আসল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইলম ও সে অনুযায়ী তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করাকেই শরীয়তের পরিভাষায় الفخاء বলা হয়।[5] তাকদীরের তিক্ত বিষয় দ্বারা ঐসব অপছন্দনীয় বিষয় উদ্দেশ্য, যা বান্দার উপর আপতিত হয়। যেমন রোগ-ব্যাদি, দারিদ্র, মানুষের কষ্ট, গরম, ঠান্ডা এবং নানা রকম ব্যথা-বেদনা।

ফুটনোট

[1] - মূলতঃ আকীদাহ বিষয়ে মূলনীতি উক্ত তিনটিই মাত্র। কিয়াস দ্বারা আকীদাহ সাব্যস্ত হয়না। তাই এখানে চতুর্থটির উল্লেখ করা হয়নি।

[2] - বুখারী, হাদীছ নং- ৯৩১।

[3] - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ

“দ্বীন হলো নসীহত বা নসীহত দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাহাবীগণ বলেনঃ আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য নসীহত? তিনি বললেনঃ আল্লাহ তাআলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিমদের শাসক এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য”। (সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং-৮২)

আল্লাহ তাআলার জন্য নসীহতের অর্থ কী?

আল্লাহ তাআলার জন্য নসীহতের অর্থ হল, সত্যিকার ভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্ কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে মেনে নেয়া। নিষ্ঠার সাথে এককভাবে তাঁর এবাদত করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। তিনি যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো বাস্তবায়ন করা, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকা, তিনি যা ভালবাসেন তা ভালবাসা এবং তাঁর অপছন্দনীয় জিনিসকে অপছন্দ করা। মুমিন বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা আর কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করল সে স্বীয় প্রভুর জন্য নসীহত আদায় করল। পবিত্র কুরআন থেকে এই হাদীছের সমর্থনে নিম্নের আয়াতটি সাক্ষ্য হিসেবে প্রযোজ্যঃ

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ﴾

“দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং তাদের সাথে মনের দিক থেকে পবিত্র হবে।” (সূরা তাওবাঃ ৯১)

আল্লাহর কিতাবের নসীহত:

এ কথার অর্থ হলো, কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা। যেমন ঈমান রেখেছিলেন সালাফে সালাহীন তথা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ। ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আল্-কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। তা আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে। অহী আকারে তিনি উহা অবতীর্ণ করেছেন। মুমিনগণ সত্য হিসেবে উহা বিশ্বাস করে এবং দৃঢ় আস্থা রাখে যে আঙ্কুরআন সৃষ্টি জগতের ন্যায় আল্লাহর সৃষ্টি নয় বরং উহা প্রকৃতই আল্লাহর কালাম সুতরাং উহা শুনে কেউ যদি ধারণা করে যে উহা মানুষের কথা তাহলে সে কুফরী করল। এ ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা দূষ্তিকারী ও পাপাচারী বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদেরকে “সাকার” নামক জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। তিনি বলেনঃ **إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيَهُ سَقْرٌ**। যে এ কথা বলে ইহা মানুষের কথা বৈ কিছু নয়, তাকে অচিরেই আমি “সাকার” নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (শরহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া)

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্-কুরআন নিঃসন্দেহে মানুষের স্রষ্টার বাণী, উহা মানুষের কথার সাথে কোন ভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত বা পঠনও তার জন্য কল্যাণ কামনার অন্তর্গত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ **وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً** □ এবং কুরআন তেলাওয়াত করো তারতীল সহকারে সুবিন্যস্তভাবে। (সূরা মুযাম্মিলঃ ৪) এমনভাবে মুসলিমদেরকে উহা শিক্ষাদান করাও মঙ্গল কামনার অন্তর্গত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ** “তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শিখায়।” (সহীহ বুখারী, হাদীছ নং- ৪৬৩৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নসীহত:

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ **إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ** □ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ আল্লাহর রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ হলো তাঁর নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর আদেশ

ও নিষেধের আনুগত্য করা, তাঁর বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু ভাবা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে ভালবাসা, তাঁর সুন্নাহের তায়ীম করা, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাহের লালন করা, গভীর জ্ঞানলাভের জন্য উহার গবেষণা করা, প্রচার-প্রসার এবং উহার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং তাঁর মহান চরিত্রে চরিত্রবান হতে সচেষ্ট থাকা। {(তাফসীরে কুরতুবী, (৮/২২৭))}

মুসলিম শাসকদের জন্য নসীহত:

মুসলিম শাসকদের মঙ্গল কামনা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, শাসকদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদেরকে সহযোগিতা করা, উদাসীনতার মুহূর্তে সতর্ক করা, ভুল-ত্রুটির মুহূর্তে বিদ্রোহ না করে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তাদের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ কামনা হলো, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় ও যুলুমের পথ থেকে তাদেরকে বাধা দান করা। {(ফতহুলবারী, ১/১৩৮)}

সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনাঃ

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলজনক বিষয়ে নির্দেশনা দান, দ্বীনের অজানা বিষয়ে জ্ঞান দান করা এবং এ ব্যাপারে কথা ও কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখা এবং তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। ক্ষতি এবং কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা তথা তাদের হিতসাধন করার চেষ্টা করা। দয়া ও নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। সকলের প্রতি সহনশীল হওয়া। বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি দয়া করা। উত্তম পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া, ধোঁকা ও হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা। নিজের অপছন্দনীয় বস্তু তাদের জন্য অপছন্দ করা। তাদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জতের হেফায়ত করা। মোটকথা সার্বিক দিক থেকে সাধারণ মুসলিমদেরকে সহযোগিতা করা।[৩]

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কল্যাণকামিতা শুধু মুসলিমদের সাথেই সীমিত নয়, বরং অমুসলিমদের জন্যও তা অপরিহার্য। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জাতির কল্যাণ কামনা করেছেন তথা তাদেরকে শিক ও মূর্তি পূজার অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

[4] - বুখারী, হাদীছ নং- ৯৩১।

[5] - কাযা ও কাদার কি একই জিনিষ? না উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলা মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই সবকিছু সম্পর্কে অবগত আছেন। কে কী করবে, কী পরিমাণ রিযিক গ্রহণ করবে, সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য হবে, কতদিন জীবিত থাকবে, ইত্যাদি সবই তিনি অবগত রয়েছেন। সেই অবগতি অনুযায়ী তিনি সবকিছু সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। কাযা ও কাদারের মূল তাৎপর্য এটিই। আল্লাহই

সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8548>

হাদিসবিভিন্ন প্রজেক্টে অনুদান দিন